ভেতর থেকে বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ

মাসুমুর রহমান খলিলী ঃ নানা ধরনের হতাশার মধ্যেও ভেতর থেকে বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বদলে যাবার এ অবিরাম গতিময়তায় মাঝেমধ্যে বাদ সাধে রাজনৈতিক অস্থিরতা, খুন-খারাবি বা সন্ত্রাসের মত বিপত্তি। তবুও এক অন্তর্নিহিত তেজোদীপ্ত শক্তিতে বলীয়ান বাংলাদেশের অর্থনীতি। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদের ভাষায়– ধাক্কা সহ্য করার এতটা প্রবল শক্তি বাংলাদেশের অর্থনীতি অর্জন করেছে যে, প্রতিকূলতার মধ্যে একটু চুপ করে থেকে আবার এগুতে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরও বাংলাদেশের অর্থনীতির এগিয়ে যাবার এই অন্তর্নিহিত শক্তির কথা উল্লেখ করেন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির এই ভেতর থেকে বদলে যাবার প্রতিফলন শুধু পরিসংখ্যানের কঠিন উপাত্তে ধরা পড়ছে তাই নয়, গ্রামীণ বাংলার জীবনচিত্র এবং নগর জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় পরিবর্তনের।

মাথাপিছু আয় ঃ দুই দশকের উল্লম্ফন

দূর থেকে অর্থনীতিকে দেখার জন্য প্রথমেই দৃষ্টি দেয়া হয় মাথাপিছু আয়ের উপর। মাথাপিছু আয়ে গত দু'দশকে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৮৩ সাল এবং ২০০৩ সাল– এই দুই দশকের ব্যবধানে দেশের মানুষের গড় আয় বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশী। ১৯৮৩ সালে প্রতিজন বাংলাদেশীর গড় আয় ছিল পৌনে ২শ' আমেরিকান ডলার। আর ২০০৩ অর্থ বছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ৪১১ মার্কিন ডলার।

ডলারের গতানুগতিক মূল জাতীয় আয় বা জিএনআই হিসাবে একাধিক দেশের জনগণের প্রকৃত আয়ের তুলনা সঠিকভাবে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এজন্য ডলারের সমানুপাতিক ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনা করে প্রকৃত জাতীয় আয় হিসাব করা হয়। যেমন, ঢাকায় ১ ডলারে ৩ ডজন সাগর কলা পাওয়া গেলেও ওয়াশিংটনে এ কলা কিনতে ১২ ডলারের প্রয়োজন হয়। যে বাসা ঢাকা শহরে ১০০ ডলারে ভাড়া পাওয়া যায় সেই একই বাসা ভাড়ার জন্য ৮০০ ডলার লাগে ওয়াশিংটনে। এভাবে ডলারের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা একেক দেশে একেক রকম। এই প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা বিচারেও বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে ব্যাপক হারে। দুই দশকের আগের তুলনায় দ্বিগুণের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে ক্রয়ক্ষমতা বিচারে জাতীয় আয়। ২০০১ সালে ক্রয়ক্ষমতা বিচারে জাতীয় আয় ছিল ১৬১০ ডলার এবং ২০০৩ সালে তা ১৮২০ ডলারে উন্নীত হয়।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ১ মার্কিন ডলারে বাংলাদেশে চাল পাওয়া যেত ৪ সেরের মত। টাকার অংকে চালের দাম বাড়লেও এখন প্রতি ডলারে ৫ কেজির মত চাল পাওয়া যায়। দুই দশক আগে মাঝারি মানের একটি শার্ট কিনতে ৪/৫ ডলারের সমপরিমাণ টাকা প্রয়োজন হত। এখন দুই/আড়াই ডলারে একই মানের শার্ট পাওয়া যায়। শাড়ীর মূল্য কমেছে আরো অধিক হারে। টাকার চলতি মূল্যে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি দেখা গেলেও ডলারের মানে রূপান্তর করে হিসাব করলে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার ব্যয় কমেছে। অথচ স্থূল জাতীয় আয় অথবা সমক্রয়ক্ষমতার হিসাব উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় আয় বেড়েছে।

নীরব বিপ্লব গ্রামীণ অর্থনীতিতে

বাংলাদেশের ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। জাতীয় আয়ে কম-বেশী তিন-চতুর্থাংশ গ্রাম এলাকা থেকে আসে। জীবানযাত্রার ব্যয় তথা ভোক্তা সূচক হিসাবেও ৭৫ শতাংশ অংশীদারিত্ব ধরা হয় পল্লী এলাকার। ফলে গ্রামের পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য বিশাল পরিবর্তন।

গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি হল কৃষি। বাংলাদেশের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের শতভাগ উৎপাদিত হয় গ্রাম এলাকায়। কৃষির যে কোন উন্নতি গ্রামীণ জনগণের জীবনের উপর প্রভাব ফেলে। গত ২ দশকে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বছরে ১ কোটি ৫২ লাখ টন থেকে বেড়ে ২ কোটি ৬৭ লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। আবাদি জমি কমার

পরও খাদ্যশস্য উৎপাদন দ্বিগুণের কাছাকাছি বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রাম এলাকায় কৃষিখাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে। এখন ফসলের মৌসুমে দেশের অধিকাংশ এলাকায় কৃষি শ্রমিকদের মজুরী খাওয়াসহ একশ' থেকে দেড়শ' টাকা। খাদ্যশস্যের বাইরেও অন্যান্য কৃষিপণ্যের উফশী জাতের আবাদ বেড়েছে। এসব ক্ষেত্রে একটি বিরাট অবদান রেখেছে কৃষিঋণ। গত এক দশক জুড়ে গড়ে আড়াই থেকে তিন হাজার কোটি টাকা স্বল্প সুদে কৃষিঋণ বিতরণ করা হয়েছে। দুর্যোগ-দুর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য দুই দফা ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ ও কৃষিঋণের সুদ মওকুফ করা হয়েছে। গ্রামের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য এ উদ্যোগ বিশাল উপকার নিয়ে এসেছে।

ক্ষুদ্র ঋণও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে বিরাট অবদান রেখেছে। বর্তমানে ৩ হাজার কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে। পুঞ্জীভূত ক্ষুদ্র ঋণের হিসাব করা হলে এ অংক দাঁড়ায় ২০ হাজার কোটি টাকায়। কিছু কিছু ক্ষুদ্র ঋণদাতা ঋণের উপর ৩০/৪০ শতাংশ সুদ নেয়ায় অনেক ক্ষেত্রে তা দারিদ্র্য থেকে ঋণগ্রহীতাদের মুক্তিদানের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে গ্রামীণ ব্যাংকসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মোটামুটি নিম্ন সুদে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। এতে গ্রামীণ মহিলাদের আয় করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপকভাবে। ছোটখাটো কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পোলট্রি, ডেয়ারী, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি কর্মসূচীতে ক্ষুদ্র ঋণ বড় ভূমিকা রেখেছে। এর সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে গ্রামীণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। এর সাথে সম্পূরক ভূমিকা রেখেছে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচী। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ব্যাপকভাবে রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন হওয়ায় উৎপাদন কেন্দ্র ও বাজারের সাথে সহজ সংযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবার পেছনে এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবার প্রভাব দু'টি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে বেশকিছু ভোগ্য পণ্যভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠেছে। দুই দশক আগে হাতে গোনা কয়েকটি প্রসাধন কারখানা ছিল বাংলাদেশে। এখন সেক্ষেত্রে ১০/১২টি প্রসাধন ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য বাজারজাত করছে। উৎপাদিত সামগ্রীর মান ও পরিমাণ দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায় পুঁজি গঠনে। ক্ষুদ্র ঋণদানের জন্য যে বিশাল পুঁজি এখন দেশে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার ৪২ শতাংশের যোগান গ্রামের দরিদ্র মানুষেরাই দিচ্ছে। গ্রামের দরিদ্র মানুষের সঞ্চয় এবং তাদের দেয়া সুদ বা সার্ভিস চার্জ থেকে এ অর্থ আসছে। অন্যদিকে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং খাতে গ্রাম এলাকার মানুষ যে পরিমাণ আমানতের যোগান দিচ্ছে, ঋণ পাচ্ছে তার চেয়ে অনেক কম। আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং খাতে পুঁজি প্রবাহেও গ্রামীণ অর্থনীতি বড় ধরনের ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

অর্থনীতির কাঠামোতে পরিবর্তন ঃ নতুন সম্ভাবনা

গত দুই দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোতে নীরব পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থনৈতিক লেনদেনে গতি বৃদ্ধির কারণে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির মত প্রাথমিক খাতের তুলনায় শিল্প বা সেবা খাতের অবদান বাড়ছে। এক সময় এক-তৃতীয়াংশ জিডিপি'র আয় আসত কৃষি থেকে। এখন তা নেমে এসেছে ২২/২৩ শতাংশে। কৃষির উৎপাদন হ্রাস পাবার কারণেই এটি ঘটেনি বরং কৃষির উৎপাদন অব্যাহতভাবে বেড়েছে। শিল্প ও সেবা খাতের অধিক দ্রুত উন্নয়নের কারণে এসব খাত থেকে জিডিপিতে আয় বাড়ছে।

গত দুই দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক খাত বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। ৭৬ শতাংশ স্থুল রফতানী আয় আসছে এ খাত থেকে। ১০ লাখ শ্রমশক্তি এ খাতের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল যার সিংহভাগই হল মহিলা। ইউরোপ-আমেরিকার বাজারে বাংলাদেশের পরিচিতি পৌঁছে দিয়েছে এই পোশাক খাত। বৈদেশিক মুদ্রা আয় ছাড়াও দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পোশাক খাতের অপরিসীম অবদান রয়েছে।

বাংলাদেশের দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপি'র হিসাব থেকে অনেক ছোটখাটো খাত এখনো বাইরে রয়েছে। এরপরও ৫০ শতাংশের বেশী আয় সেবা খাত থেকে আসছে। নতুন নতুন বেসরকারী স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে। এ খাত থেকে জিডিপি'র আড়াই শতাংশ আয় আসছে। হাউজিং খাতের দ্রুত বিকাশ ঘটছে। ৯ শতাংশ আয় আসছে এ খাত থেকে। দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির প্রতিফলন দেখা যায় রাজধানীসহ শহর এলাকাগুলোতে বিপণী কেন্দ্রের ব্যাপক প্রসারে। মধ্যবিত্তের বিপণী কেন্দ্র বেড়েছে সবচেয়ে বেশী। গ্রাম

এলাকায়ও ছোটখাটো মার্কেট বেড়েছে। বিপণী কেন্দ্রগুলোর দ্রুত বিকাশের মধ্যে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। স্থুল দেশজ উৎপাদন ব্যবসা-বাণিজ্য খাত থেকে ১৪ শতাংশের মত আয় আসে।

বাংলাদেশে ভেতর থেকে অর্থনীতির এ বিকাশে শুধু বণিক শ্রেণী লাভবান হচ্ছে তাই নয়। অপেক্ষাকৃত ধনীক শ্রেণীর আয় অধিক বাড়ছে কিন্তু দরিদ্র মানুষের কেনার ক্ষমতাও বাড়ছে। দুই দশক আগেও ঢাকা শহরের রিকশা চালকদের পায়ে সেন্ডেল দেখা যেত কদাচিৎ। এখন সেন্ডেল কেনার সামর্থ্যহীন রিকশাচালক পাওয়া দুষ্কর। খুব অল্পসংখ্যক রিকশা চালককে এখন বিড়ি খেতে দেখা যায়, অনেকেই এখন ফিল্টার সিগারেট পানে অভ্যস্ত দেখা যায়। এ সবই অর্থনীতিতে পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

সামাজিক খাত ঃ অগ্রগতি ঈর্ষণীয়

অর্থনীতির সামাজিক খাতগুলোতে গত দুই দশকে বাংলাদেশের অগ্রগতি এক কথায় ঈর্ষণীয়। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান তার বক্তব্যে বাংলাদেশের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে সম্প্রতি আফ্রিকান দেশগুলোকে তা অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন।

১৯৮০ থেকে ২০০১ সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশের শ্রমশক্তি ৪ কোটি থেকে ৮ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু গত ১ দশকে গড়ে বেকারত্বের হার ছিল ৩.৩ শতাংশ। বেকারত্বের এই হার ভারতে ৭.৩ শতাংশ, পাকিস্তানে ৭.৮ শতাংশ এবং শ্রীলংকায় ৮.২ শতাংশ। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বিশুদ্ধ খাবার পানির সুবিধা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, টাকাদান, বয়স্ক শিক্ষা, শিশুমৃত্যুর হার– সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি দৃষ্টান্তমূলক। প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার এখন বাংলাদেশে ১০০ ভাগ। গড় আয়ু চার দশক আগের ৪০ বছর থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১ বছরে। একই সময়ের ব্যবধানে শিশুমৃত্যু প্রতি হাজারে ১৫১ জন থেকে নেমে এসেছে ৫১ জনে। ৩ দশকে বয়স্ক সাক্ষরের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি একদিনে এ শক্তি অর্জন করেনি। দেশের মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য বাসনা, সরকারী-বেসরকারী সংস্থাগুলোর প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহায়তায় এগিয়ে যাবার শক্তি তৈরী হয়েছে। এসব অগ্রগতির খবর খুন, রাহাজানি ও রাজনৈতিক সংঘাতের সংবাদ ছাপিয়ে কদাচিৎ স্থান করে নিতে পারে মিডিয়ায়। ফলে বদলে যাবার ক্ষমতা বাংলাদেশের মানুষের কতটা তা তারাই অনেক সময় জানতে পারে না। ইতিবাচক অগ্রগতির অনেক কথা দেশের মানুষ জানে না।